# লেজুড়বৃত্তি ছাত্ররাজনীতির আর কত বলি হবে

২৭ অক্টোবর ২০১৯
০০:০০
আপডেট: ২৭ অক্টোবর
২০১৯ ০০:২৬

বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরারের নৃশংস হত্যাকা-ের প্রেক্ষাপটে ছাত্ররাজনীতি, বিশেষ করে দলীয় পরিচয়ে ছাত্ররাজনীতির যে ভয়াবহ রূপ প্রকাশ্যে উন্মুক্ত হয়েছে, তা শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনকেই নয়, একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থাকেও নাড়া দিয়েছে। ছাত্ররাই তো দেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজ। তাদেরই পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিচয়ের সাধারণ তরুণ সমাজের অবস্থাও তথৈবচ, বিশেষ করে এই দুই সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কথিত সহযোগী ও অঙ্গসংগঠন হিসেবে পরিচিত। প্রতিনিয়ত যে ধরনের চিত্র ফুটে উঠছে, তাতে বলা যায় দুটি অঙ্গেই পচন ধরেছে। এর অন্যতম কারণ অধিক সময়ে ক্ষমতার বলয়ে থাকা এবং আশপাশের নেতানেত্রীদের সহযোগিতায় বেপরোয়া হয়ে ওঠা। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সরকারি দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের দাপটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া।

advertisement

কথা হচ্ছিল কথিত ছাত্র অপরাজনীতিতে সাধারণ ছাত্রদের বলি হওয়া নিয়ে। বুয়েটে যে ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে জড়িত সরকারি দল সমর্থিত ছাত্রলীগই প্রথম নয়, এ অপসংস্কৃতি প্রায় সব দলের ক্ষমতায়নে তাদের ছাত্র সংগঠন দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন লাগাতার ক্ষমতায় থাকা এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক দলের দাপটের সামনে কোনো বড় চ্যালেঞ্জ না থাকায় অঙ্গ অথবা কথিত সহযোগী সংগঠনগুলোর এ অবস্থা। নিকট-অতীতের যত ঘটনা তাকে ছাপিয়ে গেছে, বুয়েটে ঘটে যাওয়া মধ্যযুগীয় বর্বরতার মতো সহপাঠী কর্তৃক পিটিয়ে আরেক সহপাঠীকে ঠা-া মাথায় হত্যা করা। এ হত্যা নিয়ে উত্তাল ছিল বুয়েট। তাদের বেশকিছু দাবি ছিলÑ তার মধ্যে অনেক দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেও এখনো সাধারণ ছাত্ররা মাঠে রয়েছে। বুয়েটে আবরার হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদের সবাই সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং ওই সংগঠনের বুয়েটের শীর্ষ পর্যায়ের ছাত্র। এ হত্যার প্রেক্ষাপটে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাই কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে, গণতান্ত্রিক দেশে

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না, এমন ভাবতেও কষ্ট হয়। বাস্তবে তেমনই মনে করে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের স্থানীয় প্রধান এবং যুক্তরাজ্যের দূতরা বিবৃতি দিয়েছিলেন, যা অবশ্য সরকারকে বিব্রত করেছে। বিব্রত হওয়ারই কথা, কারণ ২০১৪ ও ২০১৮-এর নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে যেমন বিতর্ক রয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক জায়গা না দেওয়া এবং মতপ্রকাশের আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমেই অবনতিপর। কাজেই সরকারকে অনেকটা বিব্রতকর পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে।

যা-ই হোক, নানাবিধ কারণে আবরারের হত্যাকারীরা এ হত্যার পর এবং হত্যার সময়ে রাজনৈতিক রঙ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ধারণা দেওয়া হয়েছিল, আবরার জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের সদস্য। শিবির সদস্য বলেই ভিন্নমত প্রকাশ করেছে বিধায় তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে হত্যা করা হয়। একপর্যায়ে পুলিশকে ডাকা হয়েছিল শিবির সদস্য হিসেবে পুলিশে হস্তান্তর করার জন্য। তবে তার আগেই মৃত্যু হয় আবরারের। এ ধরনের অভিযোগ ধোপে টেকেনি। তবে প্রশ্ন থাকে যে, শিবির কোনো নিষিদ্ধ সংগঠন অন্তত এখন পর্যন্ত নয়। কাজেই শিবির সন্দেহে পুলিশই বা কেন ধরপাকড় করছে! উল্লেখ্য, দেশের আইনমতে দুটি সংগঠনই বৈধ এবং সরকার এখনো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। মূল দলের বৈধতার প্রশ্নে আদালতে মামলা রয়েছে বলে তথ্য থাকলেও তার অগ্রগতি নিয়ে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। জামায়াতে ইসলামীকে শুধু নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের মাধ্যমে। একটি দলের নির্বাচনের জন্য রেজিস্ট্রেশন না থাকা ওই দলকে নিষিদ্ধ করে না।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল গঠন করতে বা পরিচালিত করতে কোনো রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকে না। দল গঠন করে ঘোষণা দিলেই হয়, তা সে দল একক ব্যক্তির দলই হোক না কেন? এবং দল গঠন করে বড় দুটি দলের যে কোনো একটির সঙ্গে লেজুড় হিসেবে লাগিয়ে দিলে তো অবশ্যই কোনো কথা নেই। অন্যদিকে যতদিন পর্যন্ত সরকারি আইন বা আদালত দ্বারা কোনো দল নিষিদ্ধ না হয়, সে দল কার্যত সক্রিয় দল হিসেবেই কার্যপরিচালনা করে থাকে। এরই আলোকে প্রশ্ন থাকে যে, কোনো ব্যক্তি যদি শিবিরের বা জামায়াতের সদস্য হন, তাকে গ্রেপ্তার করা বা পরিহার কোন আইনে সিদ্ধ? আরও প্রশ্ন থাকে যে, একজন 'ছাত্র' যদি শিবির সমর্থক হয় এবং কোনো ধরনের নাশকতামূলক কাজে ন্যস্ত না থাকে, তাকে পুলিশে তুলে দেওয়া অথবা মারধর করে একেবারে হত্যা করার মতো ঘটনা দেশের কোন আইনে সমর্থন করে, তা হয়তো কারও জানা নেই।

এ হত্যার পর বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো আমাদের দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্ররাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে, বিশেষ করে লেজুড় বলে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক পরিচয়ে থাকা উচিত কিনা?

বিষয়টি নিয়ে গত সপ্তাহে সুজন সভাপতি তার প্রবন্ধে উত্তর দিয়েছেন, তথাপি ২০০৮ সালের আরপিওর সংস্কারের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ বিষয়ে লিখছি। ওই সময়ে অনেক রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং শিক্ষক সমিতি ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনায় বিভিন্ন দল দ্বারা পরিচালিত ছাত্র সংগঠনের দলীয় গঠনতন্ত্রের অবস্থান নিয়ে গভীর আলোচনা হয়। শুধু ছাত্র সংগঠনই নয়, পেশাজীবীদের নিয়ে অঙ্গসংগঠন তৈরি এবং দল কর্তৃক পরিচালনার বিষয়টি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হয়।

ওই সময় অংশগ্রহণকারী প্রায় সব রাজনৈতিক দল নীতিগতভাবে রাজি হয় মূল দলের সাংগঠনিক কাঠামো থেকে ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে অঙ্গসংগঠন হিসেবে বাদ দিয়ে ওই সব সংগঠনের নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হবে, যা আরপিও ১৯৭২ ধারা ৯০ বি (১) (খ) (ররর)-তে এবং এর প্রভিশনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরপিওর এই ধারা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় পার্লামেন্টে পাস করে আইনে রূপান্তরিত করা হয়। এসব আইন প্রণয়নে অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করা হয়েছিল যে, দেশের বৃহৎ দুটি দল আরপিওর এই আইন মেনে এ ধরনের সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। কিন্তু তেমনটি হয়নি। ২০০৯ সালের নির্বাচনের পর পরই ছাত্রলীগের কাউন্সিল অধিবেশনে (হয়তো বা অন্য কোনো কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান) প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতিকে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাকা হয়েছিল। ওই সময় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ব্যাখ্যা চাইলে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, আওয়ামী লীগপ্রধান আমন্ত্রিত হওয়ায় যোগ দিয়েছেন তার বাইরে কিছুই নয়। এর পর আর এমন থাকেনি। বরং দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা আরও ঘনীভূত হয়েছে। এখানে বিএনপি, আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল এককাতারে। হালে ছাত্রলীগের শীর্ষ দুই নেতাকে বাদ দিয়ে দলীয় প্রধান ওই দুই পদে নিয়োগ দিয়েছেন। অন্যদিকে ছাত্রদলের নিজস্ব নির্বাচন নিয়েও মূল দলীয় কোন্দলে পড়েছিল। লন্ডনের নির্দেশে বিএনপির একজন প্রভাবশালী নেতার বাড়িতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ।

বাস্তবে আরপিওর আইনটি প্রয়োগের অভাবে এক প্রকার অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এই আইনের আনুষ্ঠানিক প্রয়োগকারী সংগঠন। তাদের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ অতীতেও দেখা যায়নি। ভবিষ্যতেও দেখা যাবে এমন মনে হয় না। এই আইন প্রয়োগে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, যদি রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে সরকারি দল উদ্যোগ না নেয়, তবে প্রয়োগ করা কঠিন। এই ধারা উল্লঙ্ঘন করতে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় কিনা, তেমন নজির এখনো দেখা যায়নি। তবে এ আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য দলের চেয়ে সরকারি দলের দায়িত্ব বেশি। নির্বাচন কমিশন আইন প্রয়োগের কতখানি ক্ষমতা রাখে, তা অনুমেয়। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সাদা-কালো আইনে শক্তিশালী হলেও প্রায়োগক দিক থেকে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে দুর্বল সংগঠন এবং প্রতিনিয়তই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। কাজেই নির্বাচন কমিশন এমন ক্ষমতাধর সরকারি দলের বিপরীতে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

বাংলাদেশে যে দুটি দল ক্রমান্বয়ে ক্ষমতায় এসেছে, তাদের ছাত্র সংগঠন হল দখল থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকেছে। তবে এই অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, যার উদাহরণ কত বীভৎস হতে পারে তা বুয়েটের ঘটনায় জনসমক্ষে এসেছে। বর্তমানে সরকার লাগাতার ক্ষমতায় থাকায় কথিত অঙ্গসংগঠন অথবা ছাত্রলীগের মতো সহযোগী সংগঠনগুলো দলের চেয়ে শক্তিধর হতে দেখা গেছে। ছাত্র সংগঠনের এসব আচরণের কারণে সাধারণ ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছেÑ এমন তথ্য প্রতিনিয়ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমেই সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। এর প্রতিকার অবশ্যই প্রয়োজন।

বুয়েটের আন্দোলনরত ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী, ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা নীতিগতভাবে কর্তৃপক্ষ মেনে নেওয়ার পর রাজনৈতিক তথা ছাত্র সংগঠনগুলো বেশ অস্বস্তিতে রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ছাত্রগোষ্ঠী ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল একত্রে এর বিরোধিতা করেছে বলে তথ্যে প্রকাশ। অনেক রাজনীতিবিদ একে 'বিরাজনীতিকরণ' করার প্রক্রিয়াও বলে বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু তারা আইন উল্লঙ্ঘনের প্রতিকারের কথা একবারের জন্যও উচ্চারণ করেননি।

প্রশ্ন উঠেছে, ক্যাম্পাসগুলোয় ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হবে কিনা? আমার ক্ষুদ্র মতে, ছাত্ররাজনীতি নয়, লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বেআইনি তাই সব দলকে ছাত্র সংগঠন থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পৃক্ততা বিচ্ছিন্ন করে ছাত্র সংগঠনের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করা। অন্যদিকে ছাত্ররাজনীতি গতিশীল করতে প্রত্যেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচিত করা হোক।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংকটের কোনো উন্নতি দৃশ্যমান নয়। এরই মধ্যে ছাত্ররাজরীতির নামে এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনেই নয়, সমাজের মধ্যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রদের সংগঠনের লেজুড়বৃত্তির শিকার সম্পূর্ণ শিক্ষাঙ্গন। এ পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটালে বাংলাদেশের সব অর্জন ম্লান হয়ে যাবে। সমস্যার সমাধান ছাত্ররাজনীতি বন্ধে নয়, বরং সর্বসম্মতিতে প্রণোদিত আইনের প্রয়োগে এমন পরিস্থিতি থেকে কিছুটা পরিত্রাণ দিতে পারে। অন্য কারও স্বার্থে না হলেও সরকারি দলের নিজের স্বার্থে আইন অনুযায়ী ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠনের রাজনীতি থেকে সম্পৃক্ততা বিচ্ছিন্ন করা উচিত, অন্যথায় দেশের ভবিষ্যৎ মেধাবী প্রজন্ম এমনিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমন হয়েছে এবার বুয়েটের আপাতত ২০ জন মেধাবী ছাত্র। এরা অপরাজনীতির বলি।

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন : সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং কলাম লেখক